OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 106
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 842 - 853
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 842 - 853
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

শঙ্খ ঘোষের স্মৃতিমূলক রচনায় জীবন ও সময়

প্রতীম ঘোষ
Email ID: protims0305@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Alokranjan, Buddhadev, Aiyub, Sambhu, Subhas, Bishnu, Desbhag, Sankha.

Abstract

Shankha Ghosh was a distinguished representative of post-Jibanananda Bengali poetry and an avid reader of his time. In his memoiristic writings, he recalls contemporary literary figures not merely as repositories of information but as living presences from whose memories he distils inner human emotions, joy and sorrow, decay and accumulation, love and estrangement. Figures such as Buddhadeb Basu, Subhash Mukhopadhyay, and Shakti Chattopadhyay appear alongside Shambhu Mitra through dramatic dialogue; Mahasweta Devi arrives with stories that break conventions; and Sanjida Khatun embodies dedication to music.

Ghosh captures both the warmth and tensions of personal relationships while also acknowledging the internal currents and ideological differences within contemporary literary movements. His memoir prose bears witness to how individual lives remain intertwined with broader social history.

From the Durga Puja images across the border in 'Sokalbeler Alo' (1972), through the refugee footprints in 'Supuriboner Sari' (1990), to the Partition pain and college memories in 'Ekhon Shob Alik' (1994), he revisits cultural personalities in 'Shomoyer Jolchhobi' (1998). The flute-notes of 'Ei Shohorer Rakhal' (2000), memories gathered in 'Samanya Osamanya' (2006), 'Chhera Canvaser Bag' (2007), 'Shohorpother Dhulo' (2010), 'Alposholpo Kotha' (2016), and 'Nirahong Shilpi' (2017), unfold in lucid prose, as dealt in this essay.

Discussion

শঙ্খ ঘোষের স্মৃতিমূলক রচনাগুলি পাঠককে আকর্ষণ করে নিয়ে যায় এমন এক অজানা ভুবনে যেখানে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব হয়ে ওঠে যুগযাত্রার সাক্ষ্য। এই স্মৃতিচারণার মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন কবি-অনুবাদক-প্রাবন্ধিক-অধ্যাপক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। তিনি দীর্ঘকাল পশ্চিম জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন, তৎসত্ত্বেও তাঁর হৃদয়ে ছিল বাংলা কবিতার অখণ্ড স্পন্দন। শঙ্খ ঘোষের স্মৃতিচারণে অলোকরঞ্জনকে কেবল সাহিত্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে পাওয়া যায় এমনটা নয় বরং পাওয়া যায় এক অকৃত্রিম সাথি, এক মানসিক আশ্রয় হিসেবে।

'ছেড়ে যাবার আগে' রচনায় যাদবপুরে অধ্যাপক জীবনের প্রথম দিককার কথা বলতে গিয়ে যে পারিবারিক পরিমণ্ডলের কথা এসেছে সেখানে মধ্যমণি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। যে অলোক প্রথমাবধি তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 106
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 842 - 853
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অধ্যাপনা করে এসেছেন, তিনি হঠাৎ বিভাগ বদল করে সাহিত্য বিভাগে এলেন কেন তার কোন যুক্তি খুঁজে পায়নি কেউ। সকলে বলতে থাকেন—

> "দু-বন্ধু একত্রে থাকবার জন্যই বিভাগ ছাড়ল অলোক।"[১]

সেইসময় বিভাগের অন্যতম খ্যাতিমান অধ্যাপক অলোকের ভাষাভঙ্গি ছিল 'অলৌকিক'; ছাত্রছাত্রীদের একান্ত আপনার এই আচার্যের স্বভাবে ছিল একপ্রকার বালখিল্যতা, খামখেয়ালি একটা ভাব। সেই ছেলেমানুষির কথা স্মরণ করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক তাঁদের পথচলতি একটি স্মৃতিকে তুলে এনেছেন ছাপার হরফে। তিনি পথ চলতে কিনে নেন ধুলোমাখা সবুজছোলা, আবার সেসময়ে কোন ছাত্রছাত্রীর সামনে পড়ে গেলে তার দিকেও বাড়িয়ে দিতেন সেই শালপাতাভরা ছোলা। ছাত্রছাত্রীরা দিশেহারা হলেও অলোককে দমানো অসম্ভব। এমন কত মজার স্মৃতি রয়েছে তোলা, যার বর্ণণা পাঠককে এক নিখাদ হাস্যরসের সন্ধান দেয়।

'অলোকের সঙ্গে দুই সন্ধ্যা' শীর্ষক প্রবন্ধের 'বরযাত্রীর দৌড়' অংশে এক সন্ধ্যায় বরযাত্রী যাওয়ার গল্প বলেছেন শঙ্খ। আমন্ত্রণ এনে যে পথনির্দেশ অলোক দিয়েছিল সে পথে বৃথা ভ্রমণ করে ব্যর্থ ফিরে আসাই সার হয়েছিল। ভুল বিয়েবাড়িতে প্রবেশের পর যে ঝক্কি পোহাতে হয়েছিল তাঁদের, তার সরস বর্ণণা যথার্থই হাস্য উদ্রেককারী। সেই সন্ধ্যায় পলায়নপর দুই ব্যক্তি ঢু মেরে যান বুদ্ধদেবের দুশো-দুইয়ের ঠিকানায়। ভোজবাড়ি ফেরত বলে লজ্জার দোহাই দিয়ে খিদে পেটেও যাচা অন্নকে ঠেলতে হয় তাঁদের। সেখানে খানিক সময় কাটিয়ে বাড়ি মুখো হয়ে প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া এক রেস্তোরাঁয় ঢুকে বহুসন্ধানে জুটিয়ে নেন— "একখানা চিমড়োনো ফিশ ফ্রাই...,"[২] প্রাবন্ধিকের উল্লেখানুযায়ী সেইদিন থেকেই তাঁদের বরযাত্রী যাওয়াতে ইস্তফা জারি হয়।

তাঁদের নিয়ে আর এক মজার ঘটনার সাক্ষী ময়দান। যাদবপুর থেকে ক্লাস সেরে বেরিয়ে তাঁরা বসেছেন ময়দানের অন্ধকারে। ভাবনায় তাঁদের আলোক সরকারের লেখা। এমন সময় অন্ধকারে বসা মানুষদুটিকে নিষিদ্ধ কোন কাজের সঙ্গে যুক্ত ভেবে পুলিশ তাঁদের নিয়ে যেতে থাকে থানার পথে। চূড়ান্ত অপভাষা প্রয়োগে জর্জরিত ও ক্রোধিত করে দেন দুজনকে। বহু বাকবিতণ্ডায় ছাড়া পান তাঁরা।

বুদ্ধদেব বসুর মশকরার ফলে শঙ্খ দা থেকে শঙ্খ আর আপনি থেকে তুমি হওয়ার পথে চরম ব্যর্থতা নিয়ে অলোকের ফেরার হয়ে যাওয়ার বৈচিত্র্যময় কাহিনি নিয়ে শুরু 'আমার বন্ধু অলোকরঞ্জন'-এর। দুজনের লেখার মধ্যেও অদ্ভুত মিল থাকায় তকমা জোটে –

> "...'কুমুদরঞ্জন-করুণানিধান।' অভিনন্দন অন্য একটা কারণেও, ওর মধ্যে ছিল একটা সম্পর্কের স্বীকৃতি, অলোকরঞ্জনের বন্ধু হিসেবে আমার স্বীকৃতি।"[৩]

এত বন্ধুত্বের মধ্যে যদিও অমিলটাই ছিল বেশি।

এই প্রবন্ধেই পাই তাঁদের সেই বিখ্যাত কাজ 'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত'র কথা। অনিলকুমার সিংহর 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার জন্যই এই অনুবাদ সংকলনের দায়িত্ব তাদের উপর বর্তায়। তাঁদের সেই বিপুল কলেবরের পাণ্ডুলিপি দেখে অনিল বাবুর পরাণ পাখি প্রথমে খাঁচা ছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়, পরে অবশ্য নিজ দায়িত্বে প্রকাশ করেন তা। শঙ্খ এক্ষেত্রেও বিনয় প্রদর্শন করে বলেন—

> "ওর পরিকল্পনা থেকে রূপায়ণের মধ্যে যে মানসিক ভ্রমণের পরিচয় আছে তার সবটাই ছিল অলোকের প্রায় একক অর্জন..."[৪]

এরপর অলোক বিদেশে গেলে সম্পর্ক কিছুটা চিঠির সংখ্যায় সীমিত হয়ে যায়। কিন্তু চিঠি লিখতে একেবারেই সাবলীল নন শঙ্খ। তাই বকুনি দিয়ে অলোক লেখে— "তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা ক'রে থাকি চিঠির জন্য।"[৫]

এভাবেই শঙ্খ ঘোষ তাঁর স্মৃতি গদ্যে অলোকরঞ্জন ও তাঁর বন্ধুত্বের বর্ণনার ভিতর ভরে দিয়েছেন ব্যক্তিগত উষ্ণতা, সাহিত্যের আলো এবং ইতিহাসের সাক্ষ্য।

শঙ্খ ঘোষের স্মৃতিকথামূলক রচনায় বুদ্ধদেব বসু বহুমাত্রিকতায় বর্ণিত। কখনো তিনি কবি, কখনো সমালোচক-সম্পাদক-সংগঠক-শিক্ষক আবার কখনো সাহিত্য আন্দোলনের একজন অগ্রদূত।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 106
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 842 - 853
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'অপরিচয়ের দ্যুতি' শীর্ষক রচনায় আভাসিত হয়েছে আলাপহীন বুদ্ধদেব বসুকে কয়েক মুহূর্ত দেখার স্মৃতি। ১৯৫১ সালের মধ্যবর্তী কোন এক মধ্যদিনে প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের সামনে ধুতি আর ঢোলা হাতার পাঞ্জাবি পরিহিত বুদ্ধদেব দাঁড়িয়ে, ব্যস্ত মানুষ চলমান, কেউ যেন চিনতেই পারছে না 'কবিতা' পত্রিকার বুদ্ধদেব বসুকে। মন্থর পায়ে অফিসে গিয়ে কিছু কথা বলেই নেমে এলেন তিনি, একইভাবে বেরিয়ে গেলেন কলেজ থেকে। শঙ্খ ঘোষ একবুক আবেগ নিয়ে লিখে চললেন, -

"...অপরিচয়ের দূরত্বমাখা প্রগাঢ় এক দ্যুতির ছোঁয়া পেয়ে গেছি আজ, এই নিয়েই কাটবে সারাদিন!"[৬]

পরবর্তী কোন বসন্ত বিকেলে অষ্টাদশবর্ষীয় এক যুবক চলেছে ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের পথে। বন্ধু হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর তাড়নায় তিনি নিজের গোপনতম সম্পদ তাঁর কবিতার খাতাখানি নিয়ে চলেছেন 'কবিতা' পত্রিকার জন্য। পরম কৌতূহলের উপর ভর করে মুখোমুখি হলেন মানুষটির। যথারীতি লজ্জায়-সংকোচে খাতাটি দিয়েই ফিরে আসা।

ত্রৈমাসিক 'কবিতা'য় যে, সকল তরুণ আধুনিক কবির সদা আহ্বান ছিল সে কথা 'আর এক আরম্ভের জন্য' রচনায় পাই। সেখানেই জানতে পারি এতখানি মুক্ত আহ্বানের পরেও 'কবিতা' পত্রিকার একটি নিজস্ব চরিত্র তৈরি হয়ে ওঠবার কথা।

শঙ্খ ঘোষের স্মৃতিকথা পড়তে পড়তে পাঠক কখনো কখনো সাক্ষী থাকেন বুদ্ধদেব বসুরও স্মৃতিকথার। তাঁদের সময়ের লেখকদের পারিশ্রমিকের কথা বলতে গিয়ে আবেগমথিত বুদ্ধদেব বলেন—

"কেন আমাকে অন্য কোনো জীবিকার পরিচয়ে বেঁচে থাকতে হবে,..."[৭]

শঙ্খ ঘোষের সেই আলাপচারিতা থেকে অনুভূত হয় বুদ্ধদেবের বদলে যাবার বিষয়ে। সময়ের সাথে সাথে যেন নমনীয়তা কমেছে ওঁর, এসেছে খরতা।

এমন হৃদয়স্পর্শী স্মৃতিচারণার পাশাপাশি প্রাবন্ধিক লিখেছেন 'বিনায়ক বুদ্ধদেব'-এর মতো রচনাও, যেখানে রয়েছে নির্মোহ সমালোচনা। সেখানে ধরা দিয়েছে 'অনুদ্বারণীয়' গল্পের কথা, যে গল্পে বুদ্ধদেব তাঁর জীবনব্যপী সঞ্চিত অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন। শঙ্খ শুনিয়েছেন পাঠকের সঙ্গে লেখকের দূরত্ব ঘনিয়ে নেওয়া অশোক মিত্রের 'দূরে এসে ভালো থাকি'র কথা। এখানেই বুদ্ধদেব তাঁর রূপক রচনায় আরও একবার ঘোষণা করেন তাঁর সাহিত্য ভাবনাকে। বিনায়ক দত্তর ক্ষীণ কণ্ঠ আর বুদ্ধদেব বসু যেন মিলেমিশে যান সেই ঘোষণায়। এরপর 'বুদ্ধদেবের স্বধর্ম' নামক রচনায় যুধিষ্ঠিরের মধ্যে নিজের পথচলার ছবি খুঁজে ফেরা বুদ্ধদেব স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকেন।

এইভাবেই একজন আধুনিক সাহিত্যের দিক নির্দেশকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর বস্তুবাদী সমালোচনা এবং তাঁকে নিয়ে নির্লিপ্ত সমালোচকের কলমে আবেগ-অনুভূতি সহযোগে বুদ্ধদেব বসুকে বর্ণায়িত করেছেন শঙ্খ ঘোষ তাঁর স্মৃতিমূলক রচনাগুলিতে।

বাংলা মনন ও সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে আবু সয়ীদ আইয়ুব এক অনন্য নাম। রবীন্দ্র রচনাকে যে নতুন যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার আলোয় তিনি দেখেছিলেন, তা আজও বাংলা বৌদ্ধিক জগতে অমলিন। এহেন রবীন্দ্র পিপাসুর কথা সহজতার সঙ্গেই উঠে আসে আর এক রবীন্দ্র অন্বেষকের স্মৃতিকথায়। সেখানে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তির পাশাপাশি সেই প্রজন্মের শিক্ষিত সমাজে চিন্তার ভূমিকা সম্পর্কে গভীর প্রত্যয় প্রকাশ করেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

'কবিতার পরিচয়' প্রবন্ধে আইয়ুবের দুটি চিঠির কথা উল্লেখ করেছেন শঙ্খ ঘোষ। 'কবিতা পরিচয়' পত্রিকার প্রথম দুটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা নিয়ে লিখেছিলেন শঙ্খ, আইয়ুব সেই লেখার বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করলে প্রত্যুত্তর দেন শঙ্খ। সেই নিয়েই প্রথম চিঠি। লেখাগুলি স্থান পায় 'দেশ'এর পাতাতেও। যদিও শঙ্খ জানিয়েছেন সেই উত্তর-প্রত্যুত্তরের একমাত্র বিষয় রবীন্দ্রনাথ পাঠ নিয়ে মতানৈক্য নয়, "...হয়ে দাঁড়াল দুই ভিন্ন পদ্ধতির তর্ক।"[৮]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 106
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 842 - 853
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শঙ্খকে লেখা চিঠিতে আইয়ুব জানিয়েছিলেন এই লেখাকে তর্ক বলতে তিনি একেবারেই নারাজ। সেখানে তিনি বলেছিলেন সম্মানসূচক সম্বোধনের ক্ষেত্রে তিনি দেশীয়রীতি অনুসরণেরই পক্ষপাতি। এক্ষেত্রে ধর্মের আসা যাওয়াতে তাঁর ঘোর আপত্তি এবং শেষে একেবারে ব্যক্তিগত সম্পর্কের জায়গায় নেমে এসে সস্ত্রীক আমন্ত্রন জানান শঙ্খকে।

দ্বিতীয় চিঠিতে তিনি স্বীকার করেছেন—

> "সাহিত্যনীতি বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার মতান্তর তেমন গভীর নয় বুঝতে পারছি।"[৯]

সেই পত্রেই গদ্য-ছন্দ-আধুনিক কবিদের কবিতার তির্যক গতি নিয়ে টুকরো টুকরো কথা লিখেছেন আইয়ুব। নিজের লেখার মুদ্রণের ভ্রান্তি নির্দেশ করার জন্য অকপট ধন্যবাদও জানিয়েছেন সেই প্রাজ্ঞ মনীষা।

কারণ ছাড়াই যে পাঁচ নম্বর পার্ল রোডের ঠিকানায় যাওয়া যায়, যাওয়া যায় আইয়ুবের সান্নিধ্যে 'মনের প্রাণের আরাম' নিবন্ধটিতে সে কথা বলেছেন শঙ্খ। আসলে তিনি যেন শান্তি খুঁজে পেতেন নিরাবরণ ঘরে বসে থাকা মানুষটির নিরাভরণ কথায়। তেমনই এক স্মৃতির কথা বলেছেন তিনি। যাওয়ার পথেই দেখা মিলেছিল তাঁর। যদিও কথা শুরু হয় বাড়িতে যাওয়ার পরেই। কথা শুরু হয় ওঁকে করা বিষ্ণু দের উৎসর্গ নিয়ে। সময়ের সাথে গড়িয়ে যায় কথা, বদলে যায় প্রসঙ্গ। শঙ্খর প্রশ্ন— "অনেক রকম কবিতার স্বাদ কি একইসঙ্গে পেতে পারেন না কেউ?"[১০] রবীন্দ্রনাথের উল্লেখে আইয়ুবের উত্তর—

> "তা তো নিশ্চয়ই পারেন। ওই-যে রবীন্দ্রনাথে আছে 'শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে/ ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে/ শতেক যুগের গীতিকা' ... কিন্তু তবু, রুচিতে তর-তমও হয়।"[১১]

এমন সব গভীর আলোচনার মাঝে আসে 'ডাকঘর'-এর অমলের চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু শঙ্খ বলেন, তিনি যেন নিরুপায় অমন তাৎপর্যমণ্ডিত আলোচনাকে সেই মুহূর্তে ধারণ করতে। তিনি ফিরে আসেন সমৃদ্ধ হয়ে। লিখে রাখেন— "মনের প্রাণের আরাম নিয়ে বেরিয়ে আসি পথে।"[১২]

শঙ্খ ঘোষের স্মৃতিকথার এই স্তরে আইয়ুব যেন এক আভিজাত্যের প্রতীক। যুক্তির মধ্য দিয়ে তিনি নিজের এমন একটি পরিসর তৈরি করেছিলেন যা শঙ্খর জীবনে ঝরিয়েছিল মননের স্নিগ্ধ বাদলধারা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'সময়ের জলছবি' গ্রন্থের দুটি রচনাতে আইয়ুবের স্মৃতি কিছুটা ভিন্ন মাত্রায় ধরা রয়েছে। পাঠকদের অবাক করে শঙ্খ ঘোষের মতো একজন চিন্তক বলেন, তাঁর চিন্তা উত্তেজনার অভাবে ঝিমিয়ে গেলে তিনি চিন্তার উৎস খুঁজতে ছুটে যান আইয়ুবের কাছে।

পরবর্তী আলোচনা বিষাদময়তায় ঢেকে দেয় পাঠক মনকে। তখন তাঁর চলে যাওয়ার সময়ে বসে কথা বলার ক্ষমতাও প্রায় নিঃশেষিত। তখন তিনি বলেন যতখানি, শোনেন তার থেকে বেশি। সেই অবস্থাতেও কমেনি তাঁর সহনক্ষমতা। উদ্বেগহীনভাবে তিনি যখন বলেন— "আমার চোখ তো আমি অনেকটাই পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে..."[১৩] শঙ্খ বলেন, সেই চোখ দিয়েও তিনি রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করেছেন অন্য আঙ্গিকে, অন্য পরিসরে। সব সীমাবদ্ধতাকে ধীরে ধীরে অতিক্রম করে তিনি বলিষ্ঠতা ও শ্লাঘার সঙ্গে বলেন— "সব ব্যক্তিক মন, মিলে মহামানবিক মন গড়ে উঠছে।"[১৪]

এরপর আসে সেই অনাকাঙ্খিত ক্ষণ। সেই নিরাভরণ ঘরটিতে আজ শান্তভাবে শায়িত আছেন তিনি। সেই আইয়ুব চলে গেছেন, যিনি শিখিয়েছিলেন— "শিল্প যে কোন শৌখিনতা নয়, সে যে বেঁচে থাকবারই একটা পদ্ধতি ...।"[১৫]

শঙ্খ ঘোষের স্মৃতিগদ্যে তিনি কেবল প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্য পর্যালোচনা না করে ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞতার সংযোগস্থলে পৌঁছে গিয়ে মানুষকে বিচার করেছেন, সময়কে বুঝতে চেয়েছেন। সেই সূত্রেই উজ্জ্বল আধুনিক কবি, সমাজসচেতন ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার অনন্য দৃষ্টান্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, যা একাধারে সাহিত্যসম্মত আবার গভীরভাবে ব্যক্তিগতও।

'প্রথম দেখার দিন' লেখাটির তৃতীয় পর্বে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের একান্ত ব্যক্তি অনুভূতির কথা প্রকাশিত। 'পরিচয়' পত্রিকার সেকালীন সম্পাদক সুভাষের পোস্টকার্ড দিয়ে দেখা করতে চাওয়ায় একজন যুবক কবির

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 106
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 842 - 853
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উন্মাদনা বর্ণায়িত হয়েছে এ রচনায়। সে সময়ের যুবকদের কাছে এ যেন এক অবিশ্বাস্য ঘটনা— "সাহিত্য-জগতে আমার প্রথম পুরস্কার..."[১৬] সেই কৌতুহল নিয়ে একদিন পৌঁছে যাওয়া ধর্মতলা স্ট্রিটের পত্রিকার 'খুদে' অফিসঘরে। যুবকমনের কল্পনানুযায়ী চেহারার সাদৃশ্য এবং কণ্ঠস্বরের বৈশাদৃশ্য নিয়ে হাজির হন সুভাষ। এরপর শঙ্খর জীবনের এক ভবিষ্যতের সূচনা হয় তাঁর সঙ্গে রাজপথে বেরিয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে। সেই দুপুরে 'পদাতিক' কবির সঙ্গে কদম মেলানো শঙ্খ এমন আরও কত পা মিলিয়েছেন তাঁর সঙ্গে, আলোচনা করেছেন বিচিত্র বিষয় নিয়ে।

এমন পথচলার সারিবদ্ধ বিবরণ আছে 'সুভাষদার সঙ্গে পথচলা' নামক রচনায়। ১৯৫৪ সালের এক সন্ধ্যায় চলমান দুই বাঙালি মনীষা হাঁটছেন ইডেন গার্ডেনসে। আলোর ঝলকানি থেকে তাঁরা সরে গেছেন প্রায় আলোহীন-জনহীন এক স্থানে। অগ্রজ প্রশ্ন করেছে অনুজকে, "শুনলাম তুমি পার্টি মেম্বারশিপ নেবার কথা ভাবছ?"[১৭] কমিউনিস্ট কবি অগ্রজকে কষ্ট দিতে না চাইলেও স্পষ্ট করে বলতে হয় যে, রটনা ঘটনা নয়। যদিও তাঁর সমস্ত ভয়কে বৃথা প্রমাণ করে দিয়ে সুভাষ সেদিন লিখেছিলেন—

> "পার্টিতে দলাদলি আছে, প্রথম যেদিন ধরতে পারলাম, সেদিন খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।"[১৮]

এই মানুষটি আবার দেশকে চিনেছিলেন দেশের অস্থি-মজ্জাতে। তাঁর আলাপচারিতার অনেকখানি জুড়ে থাকত "ভাষা-মানুষ-জীবন-জীবিকা...।"[১৯] এই ভালোবাসার প্রতিফলনেই তাঁর কবিতারা। তাঁর স্লোগানমুখর কবিসত্ত্বার বদল ঘটেছে ততদিনে। তাঁর সেই পর্বের কবিতার হয়ে ওঠাতে তাই রয়েছে একটা দেশের ছবি।

কবির মনে কবিতার হয়ে ওঠা নিয়েও এক ভিন্ন ধারার অভিজ্ঞতার কথা বলেন শঙ্খ। এমন কত কবিতার কথাই জেনে গেছেন তিনি অথচ সে কবিতা তখনও লেখাই হয়নি, সদ্য তৈরি হচ্ছে কবির মনোভূমিতে। তিনি বলে চলেছেন–

> "একটা ট্রাম চলে গেলে তারের যে শব্দটা হতে থাকে, সেই শব্দটাকে মনে হয় যেন কেউ 'ছি ছি' বলছে। ... এইসব নিয়েই কবিতা।"[২০]

'প্রতিক্রিয়া' প্রবন্ধের চারটি পর্বে রয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা নিয়ে ভিন্ন চার মহল থকে উঠে আসা প্রতিক্রিয়ার কথা। প্রথম পর্বে শঙ্খ ও তাঁর এম. এ. ক্লাসের বন্ধুদের প্রতিক্রিয়া ধরা রয়েছে 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কবিতা নিয়ে। তাঁদের বারেবারে মনে হয়েছে সুভাষের কবিতার বারুদ বুঝি কোথাও গিয়ে মিইয়ে গেছে মিছিল নিয়ে সেদিনের ছাপা সেই কবিতায়। পরে অবশ্য তিনি বুঝেছিলেন যে, সুভাষ বুঝিবা ধরাবাঁধা জগতটাকে ভাঙতে চাইছেন আর তাই তিনি বারবার অনুবাদ করে চলেছেন নাজিম হিকমতের কবিতার, প্রথাগত ছন্দ ভেঙে লিখেছেন যে নাজিম হিকমত।

তৃতীয় পর্বে রয়েছে সন্তোষকুমার ঘোষের প্রতিক্রিয়া। ১৯৭১ এ যেদিন চলে গেলেন তারাশঙ্কর সেদিন খোলা মাঠে বসে সন্তোষকুমারের উচ্ছ্বাস ভাবিয়েছিল শঙ্খকে। মনে হয়েছিল পাঠক বদলের কথা। অসাধারণ বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেছেন সেদিন সন্তোষের উচ্ছ্বাসের কারণ—

> "তাঁদের কারো সঙ্গেই ভাবনায় মিললো না বলে একটু একটু করে একা হতে লাগলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।"[২১]

শঙ্খ ঘোষ মনে করিয়ে দেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় মূলত একজন জনমুখী কবি। তাঁর কবিতার ভেতরে যে সরাসরি জীবনচেতনা, তা পাঠকের কাছে কেবল শিল্পরসের মাধ্যমেই পৌঁছায় না, পৌঁছায় লড়াইয়ের মন্ত্র হিসেবে। শঙ্খ ঘোষের গদ্যে কবি সুভাস যেমন উঠে আসেন, তেমনি মানুষ সুভাষও ধরা দেন। শঙ্খ ঘোষের কাছে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক শক্তিমান, অথচ সহজগম্য কবি— যিনি জীবন-সমাজ-মানবতার মেলবন্ধনে নিজের কাব্যকে স্থাপন করেছিলেন।

শঙ্খ ঘোষের স্মৃতিচিত্র যখন হয়ে ওঠে এক সাংস্কৃতিক নথি তখন সেই নথিতে শম্ভু মিত্র কেবল একজন শিল্পী নন, বরং এক নাট্যদর্শনের প্রতীক। বাংলা নাটকের ইতিহাসে শম্ভু মিত্র ছিলেন যুগচেতনার নির্মাতা। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত নাট্যদল বহুরূপী বাংলা থিয়েটারের নন্দনতত্ত্ব-মঞ্চরীতি-শিল্পভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল।

১৯৫২ সালে নাটক নিয়ে সেমিনারের সূত্র ধরে চিত্তরঞ্জন ঘোষ কতৃক ভারপ্রাপ্ত হন শঙ্খ, শম্ভু মিত্রকে রাজি করিয়ে নিয়ে আসবার ভার। একই মঞ্চে বলবেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও শম্ভু মিত্র। বন্ধু দেবপ্রসাদ চক্রবর্তীকে নিয়ে তিনি গেলেন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 106
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 842 - 853
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১১এ নাসিরুদ্দিন রোডের দোতলার ঘরে, যুক্তি-প্রতিযুক্তি না সাজিয়েও রাজি করিয়ে ফেললেন তাঁকে। নির্দিষ্ট দিনে শুরু হল সেমিনার, সেই ঘরে "বিলীয়মান সময় আর উদীয়মান সময় মুখোমুখি এখানে দাঁড়াবে আজ।"[২২]

বলতে শুরু করেছেন শিশির ভাদুড়ী, সমকালীন নাটক ও নাট্যভোক্তাদের নিয়ে বলবেন তিনি। মানুষের বদলে যাওয়া রুচি নিয়ে আক্ষেপের কমতি নেই তাঁর। এমন সময়ে হাজির দ্বিতীয় বক্তা শম্ভু, কিন্তু তিনি তো জানতেন না তাঁর সহবক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছেন শিশির ভাদুড়ী, চমক লাগা পায়ে কঠোর মুখে সহবক্তার আহ্বানে বসলেন তিনি। কিন্তু ভাষণ না দিয়ে "গোটা ঘরকে হতভম্ব করে দিয়ে দৃঢ় আর দ্রুত পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন তিনি..."[২৩] অথচ 'একটি না-সাক্ষাৎকার' নামক সাক্ষাৎকারের বর্ণনায় স্পষ্টত জানান শম্ভু, শিশিরের সাথে অজস্র নাটক করেছেন তিনি, বুঝেছেন কত কিছু, শিখেছেন তার থেকেও বেশি।

শম্ভু মিত্রের মতো প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব 'রাজা' এবং 'রাজা অয়দিপাউস' নাটকদুটিকে 'অন্ধকারের নাটক' নামে এক সুতোয় গেঁথে নেওয়া, যে নাটকদুটির মধ্যে বাহ্যসমতা খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাঁর এই অভিন্নতা স্থাপনের বয়ানস্বরূপ তিনি বলেছেন—

> "... সেই কঠিন অন্ধকারের অনুভব না হ'লে বাইরের পৃথিবীর এই চঞ্চল বসন্তোৎসবের মধ্যে রাজাকে চিনে নেওয়া যায় না।"[২৪]

শম্ভু তখন তাঁর মত করে মিলিয়ে নিতে চান আর একটি নাটককে, যার নায়ক অন্ধকারের মধ্যে দিক-দিশাহারা হয়ে বলে—

> "এ জীবন অর্থহীন। অর্থহীন এই জীবনের কালীদহে শুধু যেন ঘূর্ণাচক্র ঘোরে, ... সত্য শুধু অন্ধকার।"[২৫]

যদিও ১৯৬৪ সালের নাট্যোৎসবে সে নাটক উপহার দেওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ নাটকটি তখনও রচিতই হয়নি। রবীন্দ্রনাথের নাটক লেখার পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি অকপটে স্বীকার করেছিলেন— "এখনো পর্যন্ত নতুন নাটক আমরা কেউ লিখতে পারিনি।"[২৬] শম্ভু ঘোষ মনে করেছেন, এই না পারার অতৃপ্তি থেকেই উক্ত নাটকটি হয়ে উঠছিল।

শম্ভু ঘোষের স্মৃতিমূলক রচনায় শম্ভু মিত্র কেবল একজন নাট্যব্যক্তিত্ব নন— তিনি এক প্রতিচ্ছবি, যাঁর মধ্যে লেখক খুঁজে পেয়েছেন শিল্প, সত্য ও চিন্তার এক সংবেদী সম্মিলন। তাঁদের সম্পর্ক ছিল শিল্প ও মননের এক আন্তরিক মিলনস্থল। শম্ভু মিত্রের নাট্যভাবনা, কর্মনিষ্ঠা ও মানবিক দায়বদ্ধতা শম্ভু ঘোষকে শুধু মুগ্ধ করেনি, বারবার অনুপ্রাণিতও করেছে। আজ যখন আমরা শম্ভু ঘোষের স্মৃতিচারণাগুলি পাঠ করি, তখন দেখি এক মহান শিল্পীর চোখ দিয়ে আরেক মহান শিল্পীকে দেখার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত।

শম্ভু ঘোষের স্মৃতিমূলক গদ্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ও আলোচনা বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করে পাঠকসমাজের। সেখানে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে আলোচনা একদিকে সাহিত্যচর্চার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে, অন্যদিকে দুটি ব্যক্তিত্বের অন্তর্দৃষ্টির পারস্পরিক প্রভাবকে বোঝায়।

সালটা আনুমানিক ১৯৬০, 'দেশ' পত্রিকায় কবিতার উপর একটা বিবরণ লিখতে হবে শম্ভুকে। জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ চলে গেলেও তখন লিখছেন চল্লিশের কবিরা, তবুও শম্ভু প্রথমেই যার নাম নিলেন তিনি শক্তি। এই নির্বাচনের জন্য তাঁকে সকলে দুষেছে। কিন্তু পরে হলেও সুভাষ স্বীকার করেছেন কবি শক্তির শক্তি আছে। সুভাষের মতো একজন ডাকসাইটে খ্যাতনাম কবির পক্ষেও একথা বুঝতে এতখানি সময় লাগার কারণ আর কিছুই নয়, শক্তি লিখছেন ছকভাঙা কিছু। এ তো নিয়ম, বাঁধা গতের বাইরে গিয়ে কেউ কিছু করলে ধাক্কা লাগে সকলের, সময় লাগে চমক ভাঙতে।

এরপর শম্ভু বলেন ব্যক্তি অভিজ্ঞতার কথা। তাঁর ভাই নিত্যপ্রিয়র বন্ধু হওয়ার সূত্রেই তিনিও শম্ভুকে ডাকতেন ছোড়দা, অনেকখানি বয়স পেড়িয়ে গেলেও সেই সম্বোধন আজও কখনো কখনো শুনতে পান শম্ভু। এতখানি সংসারী একজন মানুষকে নিয়েও যখন রটনা হয় মদ্যপ পরিচয়ে তখন শম্ভু শুনিয়ে যেতে চান তাঁর গৃহস্থ রূপের কাহিনি। তাঁর মনে হয় শক্তির এই চরিত্রকে আশ্রয় করেই ওঁর কবিতা ভুবন তৈরি হয়েছে—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 106
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 842 - 853
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "পথে-বিপথে এই কবির টান, কেবলই কোনো যাওয়ার কথায় ভরে থাকে তাঁর কবিতা, কিন্তু সেই সঙ্গে কেবলই থেকে যায় কত পিছুটান...। এই তাকানোর মায়ার মধ্যেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্ব, তাঁর কবিতা।"[২৭]

গ্রাম থেকে শহরে আসা একটি ছেলের নাম যেদিন প্রথম ছেপে এলো 'কৃত্তিবাস'-এর পাতায়, তাঁর উপমার কারিকুরিকে সেদিনও এড়িয়ে যেতে পারেননি কেউ। নাগরিকতার মাঝেও যে কেবল ভালোবাসা দেখতে চেয়েছিল, রেললাইনের লোহা-লক্কড়ের মাঝেও যে বিছিয়ে দিতে চাইছিল ভালোবাসার উত্তরীয়, "রেললাইন পাতার মতো ভালোবাসার লাইন পেতে দেবে"[২৮] কলকাতার দিকে, সে উদ্যাম শক্তি। সামাজিকতার বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি বলতে চেয়েছিলেন কবিতা শুধু শিল্পমাত্র নয়। এই বিরুদ্ধাচরণে তিনি পাশে পেয়েছিলেন বোদলেয়ারকে। সংসার আর প্রকৃতির মাঝেই যিনি খুঁজে পেয়েছেন নিজের কবিতাকে, তিনি ছিলেন কবিতার নেশায় বুঁদ। দীর্ঘ তিরিশ বছর এই কবিকে একাধিক কবিতা অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের অনুরোধে পড়তে হয়েছে তাঁর 'অবনী বাড়ি আছো'। এরপর বিশদে কবিতার তত্ত্বগত দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন শঙ্খ। সেখানে এসেছে জীবনানন্দের কবিতার তাত্ত্বিক আলোচনার দিক। সেই আলোচনা সূত্রেই এসেছে 'elimination'-এর কথা। প্রশ্ন হতে পারে, জীবনানন্দ কেন? কারণ জীবনানন্দের কাছে যে কতখানি আশ্রয়প্রার্থী ছিলেন শক্তি তার বয়ান দেয় তাঁর কবিতার নামকরণ 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে'।

একদিন বড়ো হয়ে ওঠার জন্য যে ছেলেটি গ্রাম থেকে এসেছিল শহরে, আসার পরেও যার বারেবারে মনে হচ্ছিল সে এবং শহর কেউ বুঝি কাউকে যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারছে না, এখন কি করবে সে? তখন সে নিজের রচনার মধ্যে নিজেকে খুঁজেছে, ভেবেছে পুরাতন যা কিছু তার সঙ্গে একটা প্রবাহগত যোগ তৈরি করে নেবে। সেই আত্মানুসন্ধানের মাঝেই তাঁর নিজের ঈশ্বরকে খোঁজা হয়ে গেছে।

সব অনুসন্ধানের শেষে ভালোবাসার কথা বলতে বলতে "ভালোবাসা ছাড়া কোনো যোগ্যতাই নাই এ দীনের"[২৯] বলেছেন চলে যাওয়ার কথা। তবে একাকী যেতে তিনি নারাজ, তিনি চান— "একাকী যাব না অসময়ে/ তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাব।"[৩০] চলেও যান একদিন, শুধু নিজের সবটুকু দিয়ে যান উত্তরকালের জন্য "আমি সব দিয়ে যাব জাগাও আমাকে/শুধু জাগরণ চাই, বারেক জীবন।"[৩১]

'ছেড়ে যাবার আগে' প্রবন্ধ থেকেই পাঠক মহল জানতে পারেন দেবীপদ ভট্টাচার্যের কথা, যিনি শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের শিক্ষক ছিলেন এবং পরবর্তীতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা সূত্রে একই ঘরে সামনাসামনি বসতেন শঙ্খ ও দেবী বাবু।

'কোথায় পায় টাকা' অংশে 'কবিতা পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক এবং কার্য্যনির্বাহী মণ্ডলীর মূলধনের উৎস নিয়ে আছে অনেক মতবিরোধ। একদিন মাস্টারমশাইকে এই পত্রিকার ক্ষতিকর দিক নিয়ে এক ছাত্রকে বলতে শোনেন শঙ্খ, অবিশ্বাস্য ভাব নিয়েই জিজ্ঞাসা করেন— "এ কি আপনি সত্যি বলে ভাবেন?"[৩২] উত্তরে মাস্টারমশাই বোঝাতে থাকেন শান্তস্বরে, বোঝান নকশা এঁকে। বলতে থাকেন বুদ্ধদেব, আইয়ুবের মতো মানুষরা মদত না দিলে এমন একটা পত্রিকার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া অমরেন্দ্রর পক্ষে অসম্ভব। শঙ্খও বিনয় প্রদর্শন করে বলেন, সেই যুবকটির খাবার খরচ বাঁচিয়ে, অন্যের বাড়িতে রাত কাটিয়ে, পায়ে হেঁটে শুধুমাত্র ভালোবাসা থেকে পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামের সাক্ষী তিনি নিজে, সুতরাং "বুঝতে পারছ না, টাকাটা আসছে কোত্থেকে?"[৩৩] এই প্রশ্নের উত্তর শঙ্খর জানা। যদিও দেবীবাবু পুনারায় অলোক এবং শঙ্খকে স্নেহবশত এর থেকে সরে আসতে বলেন।

ওই বইয়েরই 'আগলে রাখা বুক' রচনায় তিনি আবার দেবীবাবুকে একজন প্রকৃত মানুষ রূপে তুলে ধরলেন পাঠক হৃদয়ের কাছে। একদিন যাদবপুরের গেটে বাস থেকে একজন নিরীহ ছেলেকে টেনে নামিয়ে এনে রাস্তায় ফেললো একদল মানুষ, তাদের সমবেত কণ্ঠ তখন 'নকশাল নকশাল' ধ্বনিতে উচ্চকিত। ছেলেটির মাথার উপরে উদ্যত বেশ কিছু মোটা মোটা লাঠি। এমন সময়ে বাস থেকে নেমে আসেন আযৌবন বামপন্থী সাহিত্যের অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য। সেই ছেলেদের কেউ তার ছাত্র কিনা সে হিসেব না করে অনায়াসে ঢুকে যান ভিড়ের মাঝে আর শঙ্খ দেখেন, "চিরন্তন ওই মাস্টারমশাই,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 106
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 842 - 853
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সম্পূর্ণ অজানা সেই আক্রান্ত ছাত্রটিকে জাপটে নেন তাঁর প্রশস্ত বুকে...।"[৩৪] সেদিন ছেলেটির গায়ে কেউ হাত দিতে পারেওনি, তাকে অন্য বাসে তুলে দিয়ে ঘটনার নিষ্পত্তি হলেও কাহিনিটি সকলের অগোচরে থেকে যায়।

শঙ্খ ঘোষের স্মৃতিমূলক রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল স্মৃতি ও ইতিহাসের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে মানবিক বেদনাকে উপলব্ধি করা। তাঁর স্মৃতিমূলক রচনাগুলিতে দেশভাগের প্রসঙ্গ এসেছে ব্যথিত মানবচেতনার দিক থেকে, যেখানে তিনি শুধুমাত্র রাজনৈতিক ঘটনাকে নয়, মানুষের ভেতরের ক্ষতচিহ্নকেই প্রধান করে তুলেছেন। একজন কবি হিসেবে তাঁর অনুভব ছিল সূক্ষ্ম, আবার একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল ভীষণ তীক্ষ্ণ। দেশভাগের স্মৃতিতে বেদনামর্মর হয়ে আছে তাঁর 'সকালবেলার আলো', 'সুপুরিবনের সারি' ও 'শহরপথের ধুলো' শীর্ষক রচনা তিনটি। এর নায়ক বা কথক নীলু যে আদতে শঙ্খ ঘোষ সেকথা পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না। 'সুপুরিবনের সারি' রচনায় বর্ণিত দুর্গাপুজোর সাথে হুবুহু মিলে যায় 'এখন সব অলীক' বইয়ের 'সপ্তমীর দিন' রচনার দুর্গা পুজোর কথা।

আবার 'সুপুরিবনের সারি'র পঞ্চম পরিচ্ছেদে নীলুর দাদা তাদের যে গান শিখিয়েছিল 'দাদার মতো দাদা' প্রবন্ধে শঙ্খর বড়োদাদা সত্যপ্রিয় ঘোষও তাঁদের ছেলেবেলায় ওই গানই শিখিয়েছিলেন এবং 'বন্দেমাতরম' শব্দের পরিবর্তন এনে যে গান দাঁড়ায় তাও একিই। 'সুপুরিবনের সারি'র বর্ণনাটি কিছুটা এরূপ–

> "অল্প একটু পালটে নিয়ে ওই গানটাই নীলুরা সবাই মিলে গেয়েছিল সেদিন—
> শ্মশানে কি নতুন করে লাগল প্রাণের রং
> সঞ্জীবনী মন্ত্র সে কী, জাগল সবার মন!
> জাগল সবার মন! জাগল সবার মন! জাগল সবার মন!"[৩৫]

'দাদার মতো দাদা'তে পাই–

> "ঠিক আছে, যেখানে যেখানে 'বন্দেমাতরম' সেখানে সেখানে বলবি সবাই 'জাগল সবার মন'।...
> শ্মশানে কি নতুন করে লাগল প্রাণের রং
> সঞ্জীবনী মন্ত্র সে কী-জাগল সবার মন!
> জাগল সবার মন-জাগল সবার মন-জাগল সবার মন।"[৩৬]

অতএব একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে নীলুর স্মৃতিচারণা আদতেই শঙ্খ ঘোষের আত্মজীবনের বর্ণনা। স্বভাবতই 'সকালবেলার আলো'য় বারেবারে ভেসে ওঠে নীলুর মামাবাড়ির স্মৃতি, সেই ওপার বাঙলার ছবি। মামারা, দিদিমা সবমিলিয়ে অন্যরকম আনন্দে মাতোয়ারা ছিল সেই জীবনটা।

কলকাতার ছেচল্লিশের দাঙ্গার পরে পরেই ঘর ছাড়তে হয় শঙ্খদের, তখনো দেশভাগ হয়নি। প্রতিবেশীদের ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের কথা সেদিন ভাবতে পারেননি তাঁর বাবা, যদিও প্রতিবেশীরা মনে করতেন ওনাদের বাড়িটাই বুঝি মূল লক্ষ, ওঁরা বাড়ি ছাড়লেই সম্ভব পাড়াটাকে নিরাপদ করে ফেলা। এরপরেই সেই মর্মন্তুদ বর্ণনা চোখে পড়ে, "একদিন গভীর রাতে সহশিক্ষকেরা এসে পৌঁছলেন কজন। ... অনেক আকুতি করে গৃহত্যাগে তাঁরা রাজি করলেন বাবাকে। ঘুমন্ত আমাদের ঠেলে তুলে মা বললেন, 'চল্ চল্ এখনই যেতে হবে।'...

আমরা হাঁটতে থাকলাম ভিন্ন আশ্রয়ের দিকে। আক্রান্ত হলেও হতে পারে যে-বাড়ি, তাকে পাহারা দেবার জন্য, তাকে বাঁচাবার জন্য, বৈঠকখানার দরজা ধরে সেই অন্ধকারের মধ্যে রয়ে গেল দাদা। দাদার বয়স তখন ঠিক-ঠিক বাইশ।"[৩৭]

'বাবার চিঠি মাকে' নামক রচনার অবতারণা করেই এমন ব্যক্তিগত চিঠিকে সর্বসমক্ষে আনার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন করে লেখক যখন লেখেন - "কিন্তু শুধু ব্যক্তিগতই কি? ... সেদিনকার মধ্যবিত্ত জীবনের সেই সন্দেহ আর ভয়ের এক ইতিহাসলিপি যেন গাঁথা হয়ে আছে এই চিঠির মধ্যে।"[৩৮] তখন দেশভাগের হৃদয়বিদারক যন্ত্রণার কথা আর লুক্কায়িত থাকে না।

প্রথমে আশঙ্কা থেকে লজ্জায় অপমানে আড়ষ্ট হয়ে লুকিয়ে আশ্রয় খোঁজা তারপর সেই আশঙ্কা সত্যে রূপ নিল যেদিন সেদিন সব জিনিস গুছিয়ে প্রায় অসুস্থ বাবাকে পুরনো জায়গায় ফেলে তাঁদের নতুন বাসায় পারি জমানো - এই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 106
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 842 - 853
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সবটা খুব সহজ ছিল না ওই বয়সের একজন ছেলের পক্ষে। সেই কঠিন কাজের বর্ণনাই তাঁর নায়ক নীলু খুব সুন্দর করে বলেছে—

> "শেষ? হ্যাঁ, শেষ। প্রণাম তোমায়, শেষ। প্রণাম তোমায়, এই দ্বাদশীর বিকেল। প্রণাম, ওই খালের মুখে নদীর জলের ঢেউ। প্রণাম তোমায় তুলসীতলা, মঠ। প্রণাম ফুলমামি। প্রণাম, তবে প্রণাম তোমায় সুপুরিবনের সারি।"[৩৯]

এরপর শুরু হল নীলুর রামকৃষ্ণ মিশন বেলঘড়িয়ার আবাসনে থাকা, সন্যাসীদের সংসর্গ, প্রার্থনা কক্ষের গান আর অপরদিকে শঙ্খ লিখলেন কাব্যগ্রন্থ 'ধুম লেগেছে হৃৎকমলে'। এতকিছুর মাঝেও নীলু লিখে চলে—

> "সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে একলা বুকে তুলো
> শহরপথের ধুলো
> স্নান করে দেয় যতই সে তো ততই করে ঋণী
> তাকেই যেন চিনি..."[৪০]

কারণ শহরকে তাঁর মনে হয়েছে—

> "সে-কলকাতার যে-কোনো বিন্দুতে দাঁড়ালেই নিজেকে মনে হয় নিতান্ত বাইরের লোক, অবাঞ্ছিত, থাকতে হয় তাই সন্তর্পণে।"[৪১]

'ছেড়ে যাবার আগে' রচনায় শঙ্খ লিখেছেন বিভাগীয় প্রধান অজিত দত্তের কথায় তাঁর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা ১৯৬৫ সালে। 'সাজানো বাগান' নিবন্ধে বলেছেন প্রেডেন্সিতে সদ্য সূচিত হয়েছে সহশিক্ষা। তাঁদের অধ্যাপক রাবীন্দ্রিক মতি সম্পন্ন সরোজকুমার দাস সাজানো বাগানের মতোই স্বল্পসংখ্যক ছাত্রীদের সাজিয়ে দিলেন পরিমাণে বেশি ছাত্রদের সাথে।

কলেজের বন্ধুদের মধ্যে তৈরি হয়ে ওঠা পাঠচক্রে আমন্ত্রণ জানানোর সূত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। চমক লেগেছে মানিকের উপকরণহীন ঘরখানা দেখে, বেশ কিছু কথাবার্তার পরে জানানো মাত্রেই উনি রাজি হয়ে গেলেন যাবার জন্য। শেষপর্যন্ত উনি না এলেও আক্ষেপ করেননি শঙ্খ, কাটিয়ে আসা সেই মুহূর্তটাকে আগলেই তিনি বেজায় খুশি।

বিষ্ণু দের মৃত্যুর কথা বলেও অবশ্য নিজেকে সামলে নিয়েছেন তিনি, নৈরাশ্য যেন না গ্রাস করতে পারে তাঁকে তাই আশ্রয় নিতে চেয়েছেন বিষ্ণু দের বলা কথাতেই "আমারও মেটে না সাধ, তোমার সমুদ্রে যেন মরি।"[৪২]

সমাজ বাস্তবতার নগ্ন দিকটিকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে 'নিরহং শিল্পী'র শুরুতেই লেখেন "কত সময়েই আমাদের দেখতে হয় অযোগ্যের আস্ফালন!"[৪৩] এহেন সমাজের বুকে দাঁড়িয়েও যখন তিনি দেখেন রবীন্দ্র সঙ্গীত সাধিকা সুচিত্রা মিত্রের সাধনাকে তখন তিনি বিস্মিত হন। রেকর্ডিং করতে এসে একের পর এক রেকর্ড করতে থাকেন একই গান, যতক্ষণ না নিখুঁত বলে মনে করছেন তিনি নিজে। অন্যদিকে আবার মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন অর্থসংগ্রহের জন্য শিল্পীরা একত্রিত হচ্ছেন তখন ধর্মতলা স্ট্রিটের মহড়া ঘরে দেখা মিলল সনজিদা খাতুনের, তাঁর কাছে "গান গাইতেই তাঁর আনন্দ, গান শোনানোতেই তাঁর আনন্দ।"[৪৪] 'গণ্ডিভাঙা মানুষ' রচনায় মহাশ্বেতা দেবীর কথা লিখেছেন শঙ্খ। বলেছেন তাঁর ব্যক্তিত্বের কথা, তিনি আবিষ্কার করেছেন প্রান্তিক জনসমাজকে, লিখতে চেয়েছেন উপজাতিদের কথা। সমাজব্রতে দীক্ষিত মহাশ্বেতা বেরিয়ে যান খেড়িয়াদের কাছে, ভূমিদাসদের কাছে, লোধাদের কাছে।

'উদাসীন এক ডাক্তার' নামক রচনায় বি. এন. গুহ রায়ের রূপকে উনি তুলে ধরলেন ভূমেন্দ্র গুহের কথা। এই রূপকের কথা স্পষ্ট হয় যখন তিনি লেখেন—

> "ডাক্তার আর রোগীদের কাছে ইনি ধন্বন্তরি এক ডাক্তার, কবি আর পাঠকদের কাছে ইনি প্রগাঢ় এক কবি, গবেষক আর ভাবুকদের কাছে বিস্ময়কর এক গবেষক।"[৪৫]

বিশিষ্ট সমালোচক শিশিরকুমার দাসের কথা লিখেছিলেন 'সংযোগের মানুষ : শিশির' শিরোনামে। মানুষের মধ্যে সাম্য বিধানের আবিল কারিগর ছিলেন শিশিরকুমার।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 106
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 842 - 853
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কৃত্তিবাস পত্রিকা নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যমতা, উৎসাহ এবং মানসিক টানাপোড়েনের কথা এসেছে 'কৃত্তিবাস-এর টানাপোড়েন' লেখায়। একটি পত্রিকাকে কেন্দ্রে রেখে একজন মানুষের জীবনের আবর্তনকে দেখেছিলেন শঙ্খ। স্মৃতির কথা বলতে বলতেই বলে দেন শঙ্খ সুনীলের সঞ্জীবনী শক্তির উৎস সন্ধানের কথা। সাহিত্য যাত্রার পথে ভিন্ন দুই পথিক হয়েও সুনীলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন শঙ্খ।

'করুণ রঙিন পথ' লেখায় আসে শান্তিনিকেতনের সাহিত্যমেলার প্রসঙ্গ। অন্নদাশনঙ্করের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সেই সাহিত্যবাসরে মিলন হবে দুই পারের কবি-লেখকদের। প্রতিবেদক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন থেকে প্রেরিত হচ্ছেন রণজিৎ দাশগুপ্ত। তাঁর চোখ দিয়েই যেন এই রচনাটির মধ্যে পাঠক দেখতে পান সেই দোল উৎসবকে, সেই সাহিত্যমেলাকে। সভার সূচক বক্তা হিসেবে আছেন অশোকবিজয় রাহা, সমাপ্তি করবেন প্রবোধচন্দ্র সেন। সেতুবন্ধনের নজির হিসেবে হাজির হয়েছেন ঢাকা থেকে শামসুর রাহমান। দেশভাগের ছাপ তো বটেই এবং সেই ভাগাভাগির হাত ধরে যে আবহাওয়ার পরিবর্তন সবটাই দুই বাঙলার লেখায় স্পষ্ট। হঠাৎ মন খারাপ করা খবর আসে, বুদ্ধদেব পথশ্রমে ক্লান্ত, তিনি উপস্থিত হলেও বলতে পারবেন না কিছু। তিনি একটা চাদর গায়ে দিয়ে যখন এলেন তখন সভায় বলছেন সুভাষ, ওঁর বলা শেষ হলেই আকস্মিকভাবে বলতে শুরু করেন বুদ্ধদেব, সেই বুদ্ধদেব যিনি জানিয়েছিলেন তিনি বলবেন না, সেই বুদ্ধদেব যিনি মাইক ঠিক করার সময়টুকু ব্যয় না করেই বলতে শুরু করেছিলেন সেদিন, ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত সুভাষ। এতো তর্কের পরেও সভাশেষে সকলে দেখেন "একটা সাইকেলরিকশায় নিবিষ্ট কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছেন দুজনে রত্নকুঠির দিকে..."[৪৬]

শেষকথা : দীর্ঘ যাপন মাঝে বহুবিধ এবং বৈচিত্রময় মেধার অধিকারী মানুষদের সঙ্গ করে শঙ্খ ঘোষ সমৃদ্ধ করেছেন নিজের মননকে, প্রসারিত করেছেন নিজের চিন্তনকে, স্বস্তিও অনুভব করেছেন বিভিন্ন সময়ে। তাঁদের নিয়েই বিভিন্ন ব্যক্তিগত সময় কাটানোর মুহূর্ত থেকে শুরু করে তাঁদের প্রতিভার বিচ্ছুরণের বহুধাবিভক্ত দিক নিয়েই টুকরো টুকরো লেখা লিখেছেন শঙ্খ, বলা ভালো স্মৃতিচারণ করেছেন সেই সান্নিধ্য নিয়ে। সাবলীল-নিরাভরণ তাঁর সেই বর্ণনা পাঠকদেরও যুক্ত করেছেন অবলীলায়, করেছে সঙ্গের সঙ্গী। কখনো এসেছে ব্যক্তি মানুষ কখনো সময়, এসেছেন সমকালের প্রথিতযশা শিল্পীরা এসেছে একাধিক পত্র পত্রিকার কথাও। প্রতিটা বিষয়কেই শঙ্খ দেখেছেন পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে। বিনয়ের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন তাঁদের সঙ্গে পার করে আসা সময়টাকে। কোথাও গিয়ে আবার ব্যথিত হয়েছেন সেই সময়ের ক্ষতের কথা স্মরণ করে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাবলিকে নিজ হৃদয়বত্তার সঞ্জীবনী সুধায় অবগাহন করিয়ে করে তুলেছেন মনোহর। এই স্বল্প পরিসরে যতটুকু আলোচনার আলোয় আনা সম্ভব তারই ক্ষুদ্র প্রয়াসের শেষে এমন মধুর স্মৃতিকথামূলক রচনাগুলিকে সম্মান জানিয়ে বলা যায়–

"কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না ডেকো না সভা - এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।"[৪৭]

Reference:

১. ঘোষ শঙ্খ, 'এখন সব অলীক', 'শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৯৯
২. ঘোষ শঙ্খ, 'ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ', আজকাল পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা ৯১, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১১৮
৩. ঘোষ শঙ্খ, 'এখন সব অলীক', 'শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ২১৩

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 106
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 842 - 853
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৪. ঘোষ শঙ্খ, ‘এখন সব অলীক’, ‘শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ’, প্রথম খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ২১৯
৫. ঘোষ শঙ্খ, ‘এখন সব অলীক’, ‘শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ’, প্রথম খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ২২৩
৬. ঘোষ শঙ্খ, ‘ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ’, আজকাল পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা ৯১, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৫
৭. ঘোষ শঙ্খ, ‘ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ’, আজকাল পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা ৯১, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৪০
৮. ঘোষ শঙ্খ, ‘সামান্য অসামান্য’, প্যাপিরাস, কলকাতা ৪, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ১২১
৯. ঘোষ শঙ্খ, ‘সামান্য অসামান্য’, প্যাপিরাস, কলকাতা ৪, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ১২৭
১০. ঘোষ শঙ্খ, ‘ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ’, আজকাল পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা ৯১, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২৩
১১. ঘোষ শঙ্খ, ‘ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ’, আজকাল পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা ৯১, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২৩-২৪
১২. ঘোষ শঙ্খ, ‘ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ’, আজকাল পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা ৯১, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২৪
১৩. ঘোষ শঙ্খ, ‘সময়ের জলছবি’, ‘শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ’, দ্বিতীয় খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪৩১
১৪. ঘোষ শঙ্খ, ‘সময়ের জলছবি’, ‘শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ’, দ্বিতীয় খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪৩২-৩৩
১৫. ঘোষ শঙ্খ, ‘সময়ের জলছবি’, ‘শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ’, দ্বিতীয় খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪৩৫
১৬. ঘোষ শঙ্খ, ‘সময়ের জলছবি’, ‘শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ’, দ্বিতীয় খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪৭৩
১৭. ঘোষ শঙ্খ, ‘সামান্য অসামান্য’, প্যাপিরাস, কলকাতা ৪, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৪৮
১৮. ঘোষ শঙ্খ, ‘সামান্য অসামান্য’, প্যাপিরাস, কলকাতা ৪, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৫০
১৯. ঘোষ শঙ্খ, ‘সামান্য অসামান্য’, প্যাপিরাস, কলকাতা ৪, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৫০
২০. ঘোষ শঙ্খ, ‘সামান্য অসামান্য’, প্যাপিরাস, কলকাতা ৪, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৫৩
২১. ঘোষ শঙ্খ, ‘সামান্য অসামান্য’, প্যাপিরাস, কলকাতা ৪, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৭৩
২২. ঘোষ শঙ্খ, ‘ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ’, আজকাল পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা ৯১, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৮
২৩. ঘোষ শঙ্খ, ‘ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ’, আজকাল পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা ৯১, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২০
২৪. ঘোষ শঙ্খ, ‘এই শহরের রাখাল’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি, কলকাতা ২০, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৭৬
২৫. ঘোষ শঙ্খ, ‘এই শহরের রাখাল’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি, কলকাতা ২০, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৭৭
২৬. ঘোষ শঙ্খ, ‘এই শহরের রাখাল’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি, কলকাতা ২০, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৭৫
২৭. ঘোষ শঙ্খ, ‘সময়ের জলছবি’, ‘শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ’, দ্বিতীয় খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৫২৬-২৭

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 106
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 842 - 853
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২৮. ঘোষ শঙ্খ, ‘এই শহরের রাখাল’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি, কলকাতা ২০, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৯৮
২৯. ঘোষ শঙ্খ, ‘এই শহরের রাখাল’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি, কলকাতা ২০, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৯৯
৩০. ঘোষ শঙ্খ, ‘এই শহরের রাখাল’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি, কলকাতা ২০, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১২৩
৩১. ঘোষ শঙ্খ, ‘এই শহরের রাখাল’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি, কলকাতা ২০, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৪০
৩২. ঘোষ শঙ্খ, ‘ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ’, আজকাল পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা ৯১, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৫৭
৩৩. ঘোষ শঙ্খ, ‘ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ’, আজকাল পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা ৯১, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৫৮
৩৪. ঘোষ শঙ্খ, ‘ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ’, আজকাল পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা ৯১, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৭৪
৩৫. ঘোষ শঙ্খ, ‘সুপুরিবনের সারি’, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৬, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৭০, পৃ. ৩৬
৩৬. ঘোষ শঙ্খ, ‘সামান্য অসামান্য’, প্যাপিরাস, কলকাতা ৪, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ২৮
৩৭. ঘোষ শঙ্খ, ‘সামান্য অসামান্য’, প্যাপিরাস, কলকাতা ৪, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৩৩
৩৮. ঘোষ শঙ্খ, ‘সামান্য অসামান্য’, প্যাপিরাস, কলকাতা ৪, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৩৯
৩৯. ঘোষ শঙ্খ, ‘সুপুরিবনের সারি’, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৬, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৭০, পৃ. ৮৮
৪০. ঘোষ শঙ্খ, ‘শহরপথের ধুলো’, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৬, পৃ. ১৯৮
৪১. ঘোষ শঙ্খ, ‘এখন সব অলীক’, ‘শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ’, প্রথম খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৫৫
৪২. ঘোষ শঙ্খ, ‘সময়ের জলছবি’, ‘শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ’, দ্বিতীয় খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪৫০
৪৩. ঘোষ শঙ্খ, ‘নিরহং শিল্পী’, তালপাতা, কলকাতা ১, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১৩
৪৪. ঘোষ শঙ্খ, ‘সময়ের জলছবি’, ‘শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ’, দ্বিতীয় খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৫১৮
৪৫. ঘোষ শঙ্খ, ‘অল্পস্বল্প কথা’, পাঠক, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৯২-৯৩
৪৬. ঘোষ শঙ্খ, ‘ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ’, আজকাল পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা ৯১, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১০৭
৪৭. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ‘স্মরণ’, ‘সেঁজুতি’, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৪৫, পৃ. ২৪